বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ

মো: ফেরদৌস হোসেন*

আধুনিককালে সমাজ স্বাতন্ত্র্যের পরিসরে বিশ্বব্যাপী নারীরা অধস্তন। এই অধস্তন অবস্থার মূলে ভিত্তি পিতৃতান্ত্রিকতা। পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর পুরুষ অর্জন করেছে পরিবারের কর্তৃক ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি; নারী পরিণত হয়েছে গৌণ ভূমিকায়—সন্তান জন্ম ও প্রতিপালন এবং উৎপাদন বিচ্ছিন্নতার জন্যে। মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেকার লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন নারীদের অধস্তন করে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবার ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন নারীদেরকে সম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ফলে নারীদের মর্যাদা কমে যায়। পিতৃতন্ত্র ও ধর্মীয় বিধান যুক্তভাবে সামন্ত-যুগের নারীদের পরিণত করেছিলো ভোগের বস্তুতে। কিন্তু পুঁজিবাদ নারীদেরকে পণ্যে পরিণত করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পিতৃতন্ত্র, শ্রম বিভাজন ও ধর্মের আইনগত অধিকারের বিধানকে টিকিয়ে রাখে। ফলে রাষ্ট্রিক পরিসরে নারীর অধিকারের প্রশ্নটি সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নে উদারনৈতিক ও গোঁড়া মার্কসবাদীদের ধারণার ভিন্নতা থাকলেও উভয় স্কুলই পুঁজিবাদের বিকাশের সূত্রের মধ্যে নারী মুক্তির সম্ভাবনা চিহ্নিত করেছে। উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন যে, আইনানুগ পদ্ধতি ও মনোভঙ্গি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পিতৃতন্ত্রের বর্তমান শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা যাবে। তাঁদের মতে, ভোটাধিকার, সম-অধিকারের আইন, ইতিবাচক কাজ এবং মনোভঙ্গি পরিবর্তনের রণকৌশল, যেমন স্বাধিকার, প্রশিক্ষণ এবং সিদ্ধির মনোভাব তৈরীকরণই যথার্থ ও কার্যকর উপাদান। এক্ষেত্রে গোঁড়া মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যার ভিন্নতা অবশ্য সুস্পষ্ট। মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম-গুলো নারী-পুরুষ উভয়কে মজুরী-শ্রমিকে পরিণত করে পুঁজির শাসনা-

* রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধীনে আবদ্ধ করবে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু উদারনীতিবাদীদের পাশ্চাত্য আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং মার্কসবাদীদের পুঁজির শাসন প্রক্রিয়া—কোন ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়নি; বরং শক্তিশালী হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে পিতৃতন্ত্রের এই শক্তিশালী অবস্থানই নারীদের পরিণত করেছে প্রান্তিক ও অধস্তন জনঅংশে। বিশ্বব্যাপী নারীদের এই অধস্তনতা মূর্ত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—যা একই সাথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেলায়ও প্রযোজ্য।

তবে প্রাক্-পুঁজিবাদের তুলনায় পুঁজিবাদে এবং পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রে নারী স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিন্নতর কাঠামোর মধ্যে ভিন্নভাবে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও নারীরা সমাজ পরিসরে পুরুষের পর্যায়ে কোন ক্ষেত্রেই উন্নীত হতে পারেনি; তারা উপনীত হয়েছে প্রান্তিক অবস্থানে। এই প্রান্তিকতা ও অধস্তনতা হতে মুক্তির অভিপ্রায়ে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে ব্যাপক নারী মুক্তি আন্দোলন। ফলে নারী এখন আর প্রকৃতি-শোভন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও যৌন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চলছে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত ধারণা ও বাস্তব প্রয়োগের বিষয়। এই দ্বান্দ্বিকতার দুটি দিক হলোঃ নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব (Gender Contradiction) ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব (Class Contradiction)—যা গোঁড়া মার্কসবাদী ও র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিষ্টদের একপেশে ধারণাকে অস্বীকার করে।[১]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে হলে পিতৃতান্ত্রিকতা ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব—এই উভয় বিষয়কেই ধারণায় আনতে হবে। ঐতিহাসিক পরিসরে এই দ্বান্দ্বিকতাকে প্রয়োগ করলে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থানটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে। মূলত উপনিবেশ-পূর্ব ভারতের সমাজ সংগঠন নারীদেরকে প্রকৃতি-শোভন সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। স্বামীর মনোবাসনা পূরণ ও গার্হস্থ্য কর্মই ছিল নারীর স্বরূপ প্রকাশের মৌলিক ভিত্তি। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রথা, যেমন সতীদাহ ইত্যাদি নারীদেরকে পুরুষের পদতলে সমর্পিত করেছিল। মুসলিম সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধানও নারীদেরকে পুরুষের অনুষঙ্গ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে পিতৃতন্ত্র, শ্রম বিভাজন ও ধর্ম মিলিতভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের নারীদেরকে শৃংখলিত করেছে ব্যাপকমাত্রায়। ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক নারীবাদী ধারণার আলোকে যে-সব বিধি-বিধান প্রণীত হয়

তা উপনিবেশ-পূর্ব কালের অনেক সনাতন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধন করে নারীদেরকে সমাজ অবস্থানে অনেক সামনে নিয়ে আসে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এবং পুঁজিবাদী অর্থ-নীতির বাজার কেন্দ্রিকতা ভারতীয় সমাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজ পরিসরে নারীরা সনাতন সমাজের অমানবিকতা হতে কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার উপাদানের যোগান দিলেও ধর্মের মূল ভিত্তি এবং সামন্ত সম্পর্কের সামাজিক শর্তগুলোকে উৎপাটিত করতে পারেনি। ফলে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্নে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিকে থেকেছে। উপরন্তু, ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে-শ্রম বিভাগের সূত্রপাত ঘটায় তার মধ্যেও নারীরা বঞ্চিত হয় ব্যাপক মাত্রায়। এক-দিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আয়-উপার্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে নারী শ্রমের সামাজিক স্বীকৃতিহীনতা নারীদেরকে মজুরী শ্রমিক হিসেবেও উৎপাদন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেনি। কিন্তু উপনিবেশের আইনগত কাঠামো নারীদের জন্যে কতিপয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সক্ষম হয়েছিল। ফলে উপনিবেশোত্তর যুগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়---যদিও তা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ।

উপনিবেশোত্তর যুগে নারী অধিকারের প্রশ্নটি নারী মুক্তি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর পরিণতিতে নারী শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন সৃজন মূলক কাজে নারীদের অংশ গ্রহণের হার বেড়ে যায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে নারীমুক্তি আন্দোলন রাজনৈতিক অবয়বে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নারীমুক্তি আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে। এবং নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু যেহেতু বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী, সে কারণে রাজ-নৈতিক অবস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়েই মূলতঃ আলোচনার অবকাশ থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। তাই নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকা চিহ্নিত করতে হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে।

মূলতঃ আর্থ-সামাজিক পরিসরে বাংলাদেশের নারীরা পশ্চাদপদ অবস্থানে। আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়

পরিবারে এবং কর্ম নির্ধারিত হয় প্রাণী স্বরূপ মানবশিশুকে সভ্য মানুষে সামাজিকীকরণ করা এবং প্রকৃতিজাত অপক্ক খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে পরিণত করার মধ্যে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী, নারীরা পুরুষের তুলনায় প্রকৃতিগত ভাবেই কম যোগ্য এবং তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে পারিবারিক পরিসরে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন গ্রামীণ ও শতকরা ৮০ জন শহুরে পুরুষ নারীদেরকে তাদের চেয়ে কম যোগ্য বলে মনে করে এবং মাতৃত্বকেই নারীর সবচেয়ে কাংক্ষিত ভূমিকা বলে গণ্য করে।[২] পুরুষ প্রধান সমাজ-সম্পর্কের আবর্তের মধ্যে বাংলাদেশের নারীরাও যোগ্য স্বামীর ঘরণী হিসেবে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করে। এই অবস্থার যৌগিকতায় বাংলাদেশের নারীরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদাশীল এবং পশ্চাদপদ। ১৯৭৪ সালের শুমারী অনুযায়ী শিক্ষার হার নারীদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪'৮ ভাগ ও পুরুষের ক্ষেত্রে শতকরা ৩২.৯ ভাগ। এই শুমারী অনুযায়ী, ১০ বৎসর বা তার চেয়ে অধিক বয়সী মাত্র শতকরা ২'৫ ভাগ নারী দেশের শ্রমশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত, যেখানে পুরুষের শতকরা হার ৫৩ ভাগ।[৩] এসব তথ্য থেকে বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক অনগ্রসরতাই প্রমাণিত হয়। এর সাথে আবার জড়িত হয়ে পড়ে কতিপয় ধর্মীয় বিধান ও পর্দা প্রথা। শহরে নারীরা ধর্মীয় শৃংখল হতে আপেক্ষিক ভাবে মুক্ত। কিন্তু এদের সংখ্যা বাংলাদেশের নারীদের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। কিন্তু শতকরা ৯২ ভাগ নারী, যারা বাংলাদেশের গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় শৃংখলের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ফলে গ্রামের বসবাসকারী বাংলাদেশের নারীদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পর্দার অন্তরালে বন্দিনী।

সমাজের মূল্যবোধ অনুযায়ী একজন পুরুষ সন্তান গণ্য হয় অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে; কিন্তু নারী সন্তান সেভাবে গণ্য হয় না। শহুরে ও শিক্ষিত পরিবারের এক অতি-ক্ষুদ্র অংশে নারী সন্তান অর্থনৈতিক সম্পদ রূপে বিবেচিত—যা সমগ্র শহুরে সমাজকেও প্রতিফলিত করে না। তবে শহুরে ও শিক্ষিত পরিবারের নারীদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ এখন চাকুরী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদন সংগঠন ও সার্ভিসের সাথে যুক্ত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনায় ২'৩ ভাগ এবং পেশাজীবীদের মধ্যে ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, কৃষিবিদ ইত্যাদি ৬'৮ ভাগ নারী।[৪] মূলতঃ কর্মজীবী নারীদের সামাজিক মর্যাদা অর্থনৈতিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে সামগ্রিক সমাজ পরিসরে

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে নারীদের অংশীদারিত্বের হার অত্যন্ত কম। ১৯৮১ সালে শহর এলাকার ১০ বৎসর উর্ধ্বে ৪০ লক্ষ নারীদের মধ্যে শুধুমাত্র ৩ লক্ষকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং ২৫ লক্ষ নিয়োজিত ছিল গৃহকর্মে। ঐ একই বছর গ্রাম এলাকার ১০ বছর উর্ধ্বে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ নারীর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষের কর্মসংস্থান ছিল অথচ ১ কোটি ৮৩ লক্ষ নিয়োজিত ছিল গৃহকর্মে।[৫] যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ায় পুরুষরা প্রধানতঃ বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে যুক্ত আর নারীরা যুক্ত গৃহস্থালী অর্থনীতিতে, সেকারণে সাধারণ ভাবে পুরুষের শ্রম মজুরীর রূপ ধারণ করেছে; আর নারীদের গৃহস্থালীর কাজ মজুরীহীন থেকে গেছে। আবশ্যিকভাবে এই প্রক্রিয়াটি নারীদেরকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখে, যদিও তাদের বিনিয়োজিত কর্ম সময় পুরুষদের বিনিয়োজিত কর্ম সময়ের কাছাকাছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক।[৬]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের এই প্রান্তিকতা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও রাজনৈতিক ভূমিকার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারীদেরকে পিছনে ফেলেছে। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে বাংগালী নারীদের অংশ গ্রহণ ছিল না বললেই চলে। ঐ সময়ে নারীরা মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে যে ভোটাধিকার চর্চা করতো মূলতঃ তা ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থারই ধারাবাহিকতা। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিদের ভোট প্রদান ব্যতীত পাকিস্তান আমলে বাংগালী নারীদের নির্বাচন ক্ষেত্রে এবং দলীয় সিদ্ধান্তের পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল যেমন মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাতে ইসলামী ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন নারী অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। পার্টি সংগঠনের মতোই জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও নারীরা ছিল একই পর্যায়ে। রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—মন্ত্রিসভা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল ও পরিকল্পনা কমিশনে কোন নারী অধিষ্ঠিত হননি। তবে তৎকালে নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের সমর্থন সংগঠিত করার অভিপ্রায়ে মুসলিম লীগের একটি মহিলা শাখা গঠিত হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের দুই-একজন মহিলা (আমেনা বেগম প্রমুখ) সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছেন। এ ছাড়া, ১৯৬১ সালের হিসেবে সরকারী চাকুরীতে প্রশাসক পদে মাত্র ২০ জন নারী অধিষ্ঠিত হয়ে-

ছিলেন, তবে তাঁরা উচ্চতর প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত ছিলেন না।[৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে-সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হয় তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন ও তার প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্টার আন্দোলনে বাংগালী নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও মুক্তিযুদ্ধে অতি সামান্য সংখ্যক নারীই প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে-সব সমাজশক্তির বিকাশ ঘটে তার মধ্যে নারীরা অন্যতম। সমাজশক্তিরূপে বিকাশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে নারীরা পুরুষের মতোই মৌলিক অধিকার চর্চার সুযোগ লাভ করে।[৮] সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক অধিকারের বেলায় বিশেষ করে ভোট প্রদান, সংগঠন করার ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ নেই। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিসরে নারীদের সম অধিকারের স্বীকৃতি সাপেক্ষে আইন সভায় (জাতীয় সংসদ) ৩০০ সাধারণ আসনের আসনের পাশাপাশি নারীদের জন্য বিশেষ ভাবে ১৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনী ও আইন প্রণয়ন মূলক ভূমিকায় নারীদের অধিকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার অন্যতম "টার্গেট" হিসেবে নারী উন্নয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং উন্নয়নে নারীদের অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ সালে প্রথম সরকারী ভাবে 'মহিলা বিষয়ক বিভাগ' সৃষ্টি করা হয়।

'নারী অধিকারের স্বীকৃতি' ও 'উন্নয়নের টার্গেট হিসেবে নারী'—এই পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগের বাইরে বেসরকারী উদ্যোগেও নারীমুক্তি ও নারী উন্নয়নমূলক কিছু কিছু সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ শহুরে নারীদের রাজনৈতিক চেতনার মান ও রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের অভিপ্রায় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পর্যায়ে মহিলা পরিষদ, জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রভৃতি সংগঠনের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নের যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তার মূল প্রবণতাই হলো নারীদের জন্য কতিপয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সমাজ কল্যাণমূলক দৃষ্টিভংগি গ্রহণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক

প্রক্রিয়ায় মৌলিকভাবে প্রবিষ্টকরণের মধ্যে এ বিষয়টিকে গণ্য করা হয় না। ফলে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি বা পুরুষতান্ত্রিকতার কাঠামোগত রূপান্তর সাধন কিংবা উৎপাদন প্রণালীতে লিংগ ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পরিবর্তন-এর কোনটিই ঘটছে না। এ কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের গুণগত ও পরিমাণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি। নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মতো রাজনৈতিক অবস্থানও অধস্তনতা ও প্রান্তিকতার পর্যায়ে রয়ে গেছে—যদিও অতীতের তুলনায় বর্তমানে উদারনৈতিক নারীবাদী দর্শনের বিবেচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এখন এ প্রসংগে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীদের অবস্থান তুলে ধরতে প্রয়াসী হবো। এ পর্যায়ে দলীয় নেতৃত্বে নারীদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান, দলীয় সিদ্ধান্তে তাদের ভূমিকা ও প্রভাব, আইনসভা ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিনিধিত্ব এবং রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা হবে।

স্বাধীনতা—উত্তর বাংলাদেশে ডান, বাম ও মধ্যপন্থী নির্বিশেষে প্রতিটি দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব-কাঠামো পুরুষের নিরঙ্কুশাধীন ছিল। শুধুমাত্র দলের মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের পদটিতে একজন নারী অধিষ্ঠিত হতেন সাধারণভাবে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোঃ) সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বেগম মতিয়া চৌধুরীর নিযুক্তি। ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থার আওতায় গঠিত "বাকশালের" কেন্দ্রীয় কমিটির ১১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা সদস্য ছিলেন এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটিতে কোন মহিলা স্থান পায়নি।[৯]

পরবর্তীতে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে পুরুষ-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে কয়েকজন নারী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। এ প্রসংগে ১৯৮১ সালের এপ্রিল নাগাদ বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে নারীদের অবস্থানকে ১নং সারণীতে এবং ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ কয়েকটি দলের নেতৃত্বে নারীদের অবস্থানকে ২নং সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ

১নং ও ২নং সারণীতে নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের যে অবস্থান লক্ষ্য করা যায় তা দেশের নারী সংখ্যার হারের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। সাধারণভাবে দলীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত নারীরা স্বামী বা পিতার ইমেজে

সারণী নং—১

রাজনীতিতে নারী : দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে (১৯৮১)[১০]

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (হাসিনা)	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	২৩	০৪
,,	কার্যকরী কমিটির সদস্য	২৭	শূন্য
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (সবুর)	কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি	১১৫	০৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।	জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি	১১	০১
,,	জাতীয় কার্যকরী কমিটি	১১৪	১৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	কেন্দ্রীয় কমিটি	৫৯	০১
ইউ, পি, পি	নির্বাহী কমিটি	২৪	শূন্য

সারণী নং—২

রাজনীতিতে নারী: দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে (১৯৮৭)[১১]

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
জাতীয় পার্টি	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	৫২	০৩
আওয়ামী লীগ (হা)	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	৩১	০৬
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	পলিট ব্যুরো	০৮	শূন্য
	কেন্দ্রীয় কমিটি	৩০	০১
জাসদ (ইনু)	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	১৯	০১
মুসলীম লীগ	নির্বাহী কমিটি	১৮	০১

কিংবা দলীয় কোন্দলের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পরিপূরনের লক্ষ্যে দলের পুরুষ ব্যক্তিদের কোন-না-কোন অংশের পৃষ্টপোষকতায় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছেন। দলীয় সংগঠনের নিম্ন পর্যায় হতে গণতান্ত্রিক সম্মেলন কিংবা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রক্রিয়া পরিপূরনের মাধ্যমে নেতৃত্ব অর্জন করতে পারেন নি। ফলে প্রকৃত অর্থে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাংগঠনিক পর্যায়ে নারীরা পুরুষ নেতৃত্বের সমকক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা তাদের "প্রতীকী" মর্যাদার পরিপন্থী না হলেও প্রকৃত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সমস্যাস্বরূপ।

রাজনৈতিক দল সমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চেয়ে জেলা পর্যায়ের নেতৃতে নারীদের অবস্থান আরো অসংহত। আওয়ামী লীগের মাত্র ১টি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাদে ২নং সারণীতে উল্লেখিত কোন রাজনৈতিক দলেরই মহিলা সম্পাদক বাদে জেলা নেতৃত্বের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন নারী অধিষ্ঠিত নেই। মূল দলের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বের পাশাপাশি অংগসংগঠন সমূহের দিকে তাকালেও একই অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। দলের মহিলা শাখা বাদে অপরাপর অংগ-সংগঠন বিশেষ করে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত গৌণ। ২নং সারণীতে উল্লেখিত দলসমূহের মধ্যে একমাত্র জাতীয় পার্টির শ্রমিক সংগঠনের ১জন নারী সহ-সভাপতি পদে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সংগঠনে ১জন নারীসভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গৌণ অবস্থান ও পুরুষ-নির্ভরশীল সীমিত ভূমিকা পালনের বাস্তব চিত্রটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের স্বরূপকেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। এই প্রান্তিকতা আরো মূর্ত-নির্দিষ্টতা লাভ করেছে আইন সভা ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ে। ১৯৭৩ ও ১৯৭৯' এর সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দল ও জোটের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা এবং তাদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের নারীরা ভোট প্রদানের অধিকার চর্চা করলেও ভোট লাভের অধিকার অর্জন করেন নি। ৩নং সারণীতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে ১৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিভিন্ন কারণে জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষ প্রার্থীদের পরাজিত করে নির্বাচিত

সারণী নং—৩

সাধারণ আসনের নির্বাচনে নারীদের অবস্থান।[১২]

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	নারী প্রার্থী বিজয়ী	নারী প্রার্থী পরাজিত
১৯৭৯	৩০০	২১২৫	১৭	একজনও নয়	সকলেই

হওয়া তাঁদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দুইটি সাধারণ আসনের উপ-নির্বাচনে দুই জন নারী নির্বাচিত হন। কিন্তু একজন (সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ) তাঁর মরহুম পিতার রাজনৈতিক পরিচয় ও দলীয় প্রধান ব্যক্তির সরাসরি পৃষ্টপোষকতা ও ইমেজের উপর ভিত্তি করে এবং অপর জন (আশেকা আকবর) পারিবারিক ঐতিহ্য ও পিতার ইমেজের উপর ভিত্তি করে উক্ত উপ-নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন—নিজেদের অর্জিত রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলশ্রুতি হিসেবে নয়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ও স্বতন্ত্র বেশ কিছু সংখ্যক নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করলেও নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ৫ জন-আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, জাতীয় পার্টির হাসিনা বানু শিরিন, স্বতন্ত্র প্রার্থী বেগম লায়লা সিদ্দিকী এবং উপ-নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পার্টির বেগম হাসনা মওদুদ ও মনসুরা মহীউদ্দিন। এদের মধ্যে সকলেই পিতা বা স্বামীর ইমেজ অথবা পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত হয়েছেন। অতএব, জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ে নারীদের অবস্থান যে কত দুর্বল তা সহজেই অনুমেয়।

স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনেও নারীদের অবস্থানগত দুর্বলতা সুস্পষ্ট। ১৯৭৩, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সমূহে যথাক্রমে একজন, চারজন ও চারজন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। এ প্রসঙ্গে ৪ নং সারণীতে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চিত্রটি তুলে ধরা হলো ঃ

উক্ত সারণীতে লক্ষ্যণীয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি তা ও বিজয়ের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অতি নগন্য। ইউনিয়ন পরিষদের মতো পৌর সভাতেও নারীদের অবস্থান অতি সামান্য। উল্লেখ্য যে,

স্মারণী নং—৪

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯৭৭

পদের প্রকৃতি	মোট সংখ্যা	প্রার্থী মোট	প্রার্থী পুরুষ	প্রার্থী মহিলা	নির্বাচনের ফলাফল পুরুষ	নির্বাচনের ফলাফল মহিলা
চেয়ারম্যান	৪৩৫২	২০৮৯৮	২০৮৭৯	১৯	৪৩৪৯	৩
সদস্য	৩৯১৬৮	১৯২৬০	১৯১৬১	৯২	৩৯১৬১	৭
মোট	৪৩৫২০	১৪০১৫৮	১৪০০৪৭	১১১	৪৩৫১০	১০

দ্রষ্টব্য : একজন মহিলা ও ছাব্বিশ পুরুষ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান পদের এবং ২১৩ জন পুরুষ সদস্য পদের নির্বাচিত হন।

মোট ৭৮টি পৌর সভার মধ্যে একটিতেও কোন নারী চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। দুই-একটি পৌরসভায় কমিশনার পদে দুই-একজন নির্বাচিত হতে পেরেছেন। অধিকন্তু, ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে কোন নারী উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হননি। স্থানীয় সংস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যে মনোনয়ন প্রথা চালু হয়েছে সেই সূত্রে বেশ কিছু সংখ্যক নারী বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সংস্থায় সদস্য পদ লাভ করেছেন। যেমন—

ইউনিয়ন পরিষদে	৪৪৬০×৩=	১৩৩৮০ জন।
উপজেলা পরিষদে	৪৬০×৩=	১৩৮০ জন।[১৪]
পৌরসভায়	৭৮×৩=	২৩৪ জন।

কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সংস্থায় মনোনীত নারীরা সনাতন সমাজে তাদের ভূমিকার অনুরূপে ভূমিকাই পালন করেন অর্থাৎ প্রভাবশালী পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তে সমর্থন প্রদানের মধ্যেই তাদের ভূমিকা সীমিত রাখেন।

আইন সভা ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার বিষয়টিকে আংশিক প্রতিফলিত করে। কিন্তু মনোনয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অংশ গ্রহণের যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে না; বরং অধস্তনতা ও প্রান্তিকতাকেই প্রমাণ করে।

রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়েও নারীদের

অংশগ্রহণ অতি সামান্য। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা যেমন মন্ত্রীসভা, আমলাতন্ত্র, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল ও পরিকল্পনা কমিশনে নারীদের অবস্থান খুবই নগন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেই। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য পর্যায়ে এবং আমলাতন্ত্রের সচিব পর্যায়ে কোন নারী আজ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীসভায় দুই-একজন নারী স্থান লাভ করলেও ক্ষমতাগত বিবেচনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের (স্বরাষ্ট্র, অর্থ, সংস্থাপন ইত্যাদি) দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৫ নং সারণীতে মন্ত্রীসভায় পুরুষ ও নারীদের অবস্থানের পার্থক্য তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী নং—৫

রাজনীতিতে নারীঃ মার্চ, ১৯৭৯ থেকে মার্চ, ১৯৮২ পর্যন্ত মন্ত্রীসভায় অবস্থান।[১৫]

মন্ত্রী			প্রতি মন্ত্রী			উপ মন্ত্রী			সকল পর্যায়ে		
পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
৮৮	১	৮৯	৫১	৩	৫৪	৭	৪	১১	১৪৬	৮	১৫৪

সারণীতে লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭৯ সালের মার্চ হতে ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৯ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ১ জন, প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে ৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন এবং উপমন্ত্রী পর্যায়ে ১১ জনের মধ্যে ৪ জন নারী। উক্ত সময়ে মোট ১৫৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন নারী; তা-ও আবার ১টি বাদে সবগুলোই নিম্ন পর্যায়ে। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী পদে কখনই কোন নারী অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। মূলত ঃ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নারীদের অংশ গ্রহণ ও ভূমিকা নাই বললেই চলে।

ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সামান্য সংখ্যক নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত এবং নিজ সমাজের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুবই সীমিত।[১৬] তবুও পাশ্চাত্য বিশ্বের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ব্যাপক সামাজিক গতিশীলতা, অর্জিত মর্যাদা ও আধুনিক

শিক্ষার কারণে সনাতন সমাজের তুলনায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান তুলনামূলক বিবেচনায় অধিক সংহত। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজের সনাতন মূল্যবোধ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে বাংলাদেশের নারীরা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পর্যায়ে তাদের অধিষ্ঠিত হবার আর্থ-সামাজিক শর্ত অনুপস্থিত। যে সব সামান্য সংখ্যক নারী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা মূলতঃই শহরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য। গ্রামীণ বা শহরে নিম্নবিত্ত পরিবারে কোন নারীই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের স্তরে উন্নীত হতে পারেন নি। এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতার ব্যাপক উপস্থিতি ও শোষণমূলক চরিত্রই বাংলাদেশের নারীদেরকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক ও অধস্তন করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক ও শোষণমূলক তাই নারীদের এই প্রান্তিকতা ও অধস্তনতা বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম ও অপরিহার্য শর্ত—যা নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্যে অভিব্যক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

১. এই বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে Lydia Sargent সম্পাদিত *Women and Revolution* (Boston : South End Press, 1981) গ্রন্থে Heidi Hartmann রচিত "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism" শীর্ষক প্রবন্ধে।

২. Jahan, Rounaq, "Women in Bangladesh" in *Women for Women*, Dhaka, University Press, 1975, pp. 1-32.

৩. Chowdhury, R. H & Ahmed, N. R, *Female Status in Bangladesh*, B. I. D. S, Dhaka, p. 5.

৪. *Establishment Survey 1982*, Dhaka, p. 27.

৫. Government of Bangladesh, *Statistical Year book of Bangladesh*, 1982.

৬. বরকত-এ-খোদা ও ফেরদৌস হোসেন রচিত "গৃহস্থালী অর্থনীতিতে নারীদের আপেক্ষিক অবদান : গ্রামীণ বাংলাদেশের উপর নমুনা বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রকাশিতব্য) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৭. Jahan, Rounaq, *op.cit.*, p. 17.

৮. Article 29 (৩) (a.) and (c), *Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Dhaka, 1979.

৯. Jahan, Rounaq, *op. cit.*, p. 28.

১০. Chowdhury, Najma, "Women in Politics in Bangladesh" in ***Situation of Women in Bangladesh,*** Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1985, p. 204.

১১. উল্লেখিত দলসমূহের দায়িত্বশীল সূত্র হতে এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

১২. Chowdhury, Najma, "Women's Participation in Political Process in Bangladesh : Nature and Limitations" in ***Women and Politics in Bangladesh***, Center for Women and Development (CWD) Bangladesh, Dhaka, 1985. p. 2.

১৩. Chowdhury, Najma, "Women in Politics", *op. cit*,. p. 260.

১৪. Alam, Bilquis Ara, "Women's Participation in Local Government in Bangladesh" in ***Women and Politics in Bangladesh***, CWD, Dhaka, 1985.

১৫. Chowdhury, Najma, "Women in Politics", *op. cit.*, 1985, p. 268.

১৬. ***Women's Studies International,*** No. 2, July, 1982, p. 24.